ধূসর পথের পরশপাথর

বিশ্বজিৎ (রাণা) নাথ

সোনারপুর আরোহী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আজকের আরোহী'র সভাপতি বিশ্বজিৎ নাথ সবার কাছে রাণাদা বলে পরিচিত। রাণা ও তাঁর বন্ধুরা মিলে যে শুরুয়াত করেছিলেন আশির দশকের গোড়ায়, সে আজকের প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের কাছে অ্যাডভেঞ্চারের বিশাল উন্মুক্ত এক পাঠশালা। একদিন নিজে সদলে ঘুরে বেড়িয়েছেন হিমালয়ের অন্দরে, দিনের পর দিন, ফিবছর। আবার অন্যদেরও ঘরের বাইরে ডেকে ছুট করিয়েছেন কাছে দূরের মন ভালো করা সব জায়গায়। শ্রী রাণার কলমে ১৯৮৯-এর একটি অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছিল ২০০৮-এর বাৎসরিক পত্রিকায়। এবারের সংখ্যায় সেটি পুনঃপ্রকাশিত হ'ল।

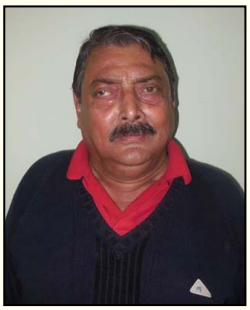

অবশেষে শিখর অভিযান বাতিল হয়েছে। ক্যাম্প ওয়ানে ভালোমত থিতু হয়ে অনেক চেষ্টা করেও ক্যাম্প-টু এর উপযুক্ত জায়গা পেলাম না। একসময় বুঝলাম, সঙ্গে যে তাঁবু রসদ ও সরঞ্জাম রয়েছে, আর আমাদের যা বাজেট তা দিয়ে এই এক্সপিডিশন হবে না। গতবছর (১৯৮৮) গাড়োয়ালে সফল 'থেলু অভিযান' করে বেশ মনে হয়েছিল, আরও বড় অভিযান সম্ভব। সেই বিশ্বাস থেকে এবছর (১৯৮৯) হিমাচলের লাহুল অঞ্চলে 'মাউন্ট ফাবরাং' (৬১৭২মি) শিখরের উদ্দেশ্যে আসা। একটু গোড়া থেকে বলি। কলকাতা থেকে রওনা দিয়েছিলাম ২০ আগস্ট, ২২ এ মানালি পৌঁছে বিস্তর ছুটোছুটি করে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে HAP জোগাড় করে বাঁধাছাঁদা সেরে গাইড শের সিং-এর উপর ভরসা রেখে উদ্দিষ্ট পর্বতের দিকে যাত্রা শুরু করতে আরও দুদিন লেগে গেল। তার আগেও পুরো পাঁচ মাসের প্রস্তুতি। সব কিছু এক নম্বর ক্যাম্পে এসে শেষ।

অনেক আফসোস হাহুতাশের মধ্যে বেস-ক্যাম্প ছেড়ে ট্রানজিট ক্যাম্প দুটি পার হয়ে সবার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে এক রাত উদেপুরে (বা উদয়পুর) কাটিয়ে উঠে পড়লাম মানালির বাসে। চন্দ্রভাগাকে সঙ্গী করে তান্ডি পর্যন্ত ছুটে সেখান থেকে চন্দ্রনদীর সঙ্গে গ্রামফু এসে রোটাং পেরিয়ে বিপাশার পাশ দিয়ে নেমে এলাম। আবার সেই মানালি শহর।

পরদিন জরুরি কাজগুলো সেরেও হাতে অনেক সময়। সময় কাটতে চায় না। ঘুরতে ঘুরতে ম্যালে চলে আসি। মানালি যেন গড়িয়াহাটা। চলছে হিমালয়ান কার র‍্যালি। কজনের সঙ্গে দেখা হয়েও যায়। আরে, বর্মন-দা না? ওই তো সুজল-দা এগিয়ে এসেছে, কথাবার্তা শুরু হয়েছে। ওরা 'নেহেরু শতবর্ষ ট্রেক' প্রোগামে জয়েন করবে বলে এসেছে এখানে। ওদেরই হোটেলে গিয়ে গপ্পোগুজব করি। পথ বেঁধে দেয় বন্ধহীন গ্রন্থি! আমাদের সমস্যা কাটছে না। হাতে এখনও চারদিন। Concession-এর টিকিট বাতিল করে নতুন করে রিজার্ভেশন অনেক ঝামেলার। পুজোর মুখে প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। অগত্যা কোনওমতে চারদিন কাটিয়েই ট্রেন ধরতে হবে চণ্ডীগড় থেকে। শীতল বলে বসল, 'মানালির বোল্ডার পর্যন্ত চেনা হয়ে গেছে। এবার যাওয়া যাক।' কথাটা ভাবার মতো। দেবু চলে যাবে লেহ্, অন্য দলের সাথে। যারা রয়ে গেলাম তাদের অনেকের সিমলা ঘোরা হয়নি। অতএব সিদ্ধান্ত হ'ল, 'কাল সকালেই চলো সিমলা।' আবার বাঁধাবাঁধি, বসের ছাদে মাল তোলা, জনলার ধারে বসা, মেঘ আর কুয়াশার শহরে যাওয়া। বিকেলে লটবহর নিয়ে সিমলা কালীবাড়ি।

তিনটে দিন কেটে গেল শুধু বাংলা কাগজ পড়ে, মাছ-ভাত খেয়ে আর ঘুরে বেড়িয়ে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে প্ল্যান-মাফিক সকাল সাড়ে ছ'টায় বাসস্ট্যান্ড। আগের বিকেল থেকে বৃষ্টি চলছে। এখন ইলশেগুঁড়ি আর

হালকা কুয়াশা। বেশ ঠাণ্ডা। বাসে মালপত্তর তুলে গরম সামোসা ও চা নিয়ে বসি। তবে জুত করে চা শেষ করার আগে বাসে উঠে পড়তে হ'ল। ড্রাইভার তাড়া দিয়েছে।

বেলা এগারোটায় চণ্ডীগড় ISBT (Inter State Bus Terminus)। এখান থেকে স্টেশন অনেকটা দূর। শম্ভু-দা ও আমি একটা টাঙ্গায় সব মালপত্র চাপিয়ে রওনা দিই। বাকিরা বাসে আসবে। টাঙ্গা বেশ দ্রুত ছুটল বটে, কিন্তু স্টেশনে নেমে দেখি, আমাদের আগে ওরা পৌঁছে গেছে। যাক, এদিকে শম্ভু-দা টাঙ্গায় বসে শুনিয়ে রেখেছে, 'ট্রেন তো সেই রাত সোয়া এগারোটায়। আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে রক-গার্ডেন দেখে আসব।' আচ্ছা বেশ। প্লাটফর্মের ভিতর দিকে মালপত্র রেখে রিজার্ভেশন স্লিপ বার করে কোচ নাম্বার জানার তাগিদে কাউন্টারে লাইন দিলাম। টার্ন আসতে টিকিট কাগজ ঢুকিয়ে দিলাম ফোকর দিয়ে। শুনলাম, 'আপকা ট্রেন আভি সায়েদ কানপুর-মে হোগা!' কী বলছে লোকটা? আমরা বলি, 'না না দেখুন, আমাদের টিকিট ১৮ সেপ্টেম্বরের, মানে আজকের।' ভিতর থেকে উত্তর আসে, 'ঠিকই তো। ১৮ তারিখের গাড়ি রাত ১২-৪৫ এ ছেড়ে গেছে।' কী অদ্ভুত কথা! ভিতর থেকে আবার বলে, 'টাইম চেঞ্জ হয়েছে আপনারা জানতেন না?'

এবার আমার হাত পা ঠাণ্ডা। মনে হ'ল, বিশাল ধ্বসের মধ্যে লক্ষ টন বরফে চাপা পড়ে আছি। অনেক দূর থেকে কে যেন বলছে, 'আরে সামনের হাম্পটা টপকালেই সামিট।' কী করি? আমাদের পাল রেলে চাকরি করে। ব্যাপার বুঝে সে এগিয়ে আসে। সবাই মিলে স্টেশন-সুপারের কাছে যাওয়া হ'ল। উনি সাফ বলে দিলেন, 'নতুন টিকিট কেটে বাড়ি যান। Concession টিকিটে কিছু করা যাবে না। টাইম চেঞ্জ হয়েছে সেটা দেখা হয়নি কেন?'

পরের কথাগুলো ছিল এরকম –

'স্যার কিছুই কি করা যায় না?'

'না।'

'তাহলে ফিরব কী করে?'

'নতুন টিকিট কাটুন।'

'এত টাকা নেই আমাদের হাতে।'

'বিনা টিকিটে যান। খাবার পাবেন না।'

ওখান থেকে বেরিয়ে আসি। চিন্তা করে কূলকিনারা পাই না। শম্ভু-দা বলে, 'পেটে বড় ভুখ, না খেলে নাই কোনও সুখ।' একজন খবর এনেছে, 'ক্যান্টিনে চাউল-রোটি-আণ্ডাকারি দশ টাকা।' আর একজন, মানে বাবু বললে, 'চলো লাস্ট খাওয়া খেয়ে নিই।' সেই ভালো। কিছু যখন করার নেই খেয়ে নেওয়া যাক। খেতে বসে বুঝলাম, বেশ ক্ষিদে পেয়েছিল। খেতে খেতে বার বার ফেরার উপায় নিয়ে কথা হয়। হাতে যা টাকা আছে কোনওমতে জেনারেল টিকিট কাটা গেলেও পথখরচ কিছু থাকবে না। তাছাড়া জেনারেল কোচে এত লম্বা জার্নিতে এত মালপত্র রাখব কোথায়?

সবাইকে বললাম, 'যার যা আছে টেবিলে জমা কর।' হুইপ জারির পরেও সবমিলিয়ে যা জড়ো হ'ল গুনে দেখলাম, তিন হাজার। সামনের টেবিলে ক্যান্টিনের ক্যাশ কাউন্টার। এখানে শুধু আমরা আর এখানকার কর্মচারীরা। টেবিলে আমাদের কাণ্ডকারখানা ওদের নজর টেনেছে। কাউন্টারের ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'কুছ খাস প্রবলেম?' এখন আর স্থান পাত্র বিচার করার সময় নয়, যাকে পাই তাকেই দুর্দশার কথা বলে ফেলি। ওকেও বললাম। সব শুনে ছেলেটি বলে, 'হাঁ, কুছ তো করনাই চাহিয়ে।'

'দেখ, আমার একটা ক্যামেরা আছে। বিক্রি করে দেব। তুমি প্লিজ দেখ, যদি কেউ নেয়।'

'আপলোগ এহিঁ পর বৈঠ রহিয়ে, ম্যায় আভ্‌ভি আয়া' – বলে সে কোথায় বেরিয়ে গেল। ফিরল সে আধঘন্টা পর। তখন সঙ্গে তাগড়াই চেহারার তিনটি ছেলে। আমি সামনে মুশকিল আসান মনে করে উঠে দাঁড়ালাম। শুরু হয় এক দফা প্রশ্নোত্তর পর্ব ---

'তোমরা এক্সপিডিশনে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ ভাই।'

'কাগজপত্র আছে সঙ্গে?'

'আছে ভাই।' পাশে রাখা ফাইলটা দেখাই।

'তাহলে তো তোমরা ডিফেন্সের লোক।'

ব্যাটা বলে কী!! আমি ওদের বুঝিয়ে বলতে যাই সব, কিন্তু ততক্ষণে ওরা ফাইল খুলে দেখতে শুরু করেছে। কতটা কী পড়ল জানি না। দারাসিং মার্কা একজন আমাদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমাদের দু-তিনজন চল আমার সঙ্গে।' চললাম আমি ও রাণা পাল। আবার স্টেশনের অফিস। গোটা স্টেশন যেন ঘুমোচ্ছে। এবার চিফ কমার্শিয়াল সুপার-এর ঘরে। আমাদের নয়া লিডার সটান ঢুকে গেল। সামনে চেয়ারে C C Super বসে। দারা সিং আমাদের তরফে সব বুঝিয়ে বলে। ছেলেটি বেশ ইংরেজি বলে, হিন্দি গুরুমুখী মিলিয়ে। সাহেব সব শুনে টিকিট দেখতে চাইলেন। দেখলেনও। ফেরৎ দিয়ে বললেন, 'সরি, ম্যায় কুছ নেহি কর্‌ পায়েঙ্গে।' বড় চেহারার ছেলেটি বড় মুখ করে নিয়ে গেছিল, সেও হতাশ হ'ল। আমাদের কথা আর কী বলি।

ক্যান্টিনে ফিরে ওকেই এবার ক্যামেরা বিক্রির কথাটা বললাম। 'সেকী! ক্যামেরা বেচে দেবে?' – সে জিজ্ঞেস করে। উত্তরে জানাই, ক্যামেরাটা বিক্রি হলে নতুন টিকিট কেটে যে যার বাড়ি ফিরে যেতে পারব। সে হাত পাতল। মানে ক্যামেরাটা চাইছে। আমি সাধের ক্যানন রেঞ্জ ফাইন্ডার বের করে ওর হাতে দিই। দাম দর কিছু না জেনে সে ওটা নিয়ে চলে গেল। শুভ (চক্রবর্তী) সকাল থেকেই চুপ, সে মুখ খোলে – 'রাণা, ওর সাথে গেলে পারতিস। শেষে না শ্যামও গেল অবস্থা হয়।' যা হবার হবে, অত আর ভাবতে পারি না। শম্ভুদা এসে কথা ঘোরায়। বলছে, তিনি নাকি কিছু ডিম নিয়ে এসেছেন, আবার ক্যান্টিন-মালিককে ম্যানেজ করে ওখানে রান্নার ব্যবস্থাও সেরে ফেলেছেন। ভালো ব্যবস্থা। বললাম, 'চালিয়ে যাও।'

দেখতে দেখতে সন্ধে নেমেছে। বসে আছি স্টেশনের বাইরে। অপেক্ষা, যদি সে আসে। হঠাৎ পিঠে আলতো ছোঁয়া, শুভ এসেছে। ওর দিকে মুখ তুলে চাইতেই বলে, 'চিন্তা করে লাভ নেই। বরং প্রশান্ত'র অফিসে ট্রাঙ্ক-কল করে বলি হাওড়ায় অ্যাটেন্ড করতে। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে তোর ক্যামেরাটা মনে হয় ভোগে গেল।' আমি চুপ করে থাকি। মনটা খিচখিচ করছে। শুভ আমাকে টেনে আবার ক্যান্টিনে নিয়ে আসে। কাউন্টারের ছেলেটি আমাকে দেখে আশ্বাস দেয়, 'দাদা, যাদা সোচিয়ে মৎ।' ইতিমধ্যে ওর নাম জেনেছি, সুকদেব। বলছে - কিচেন ফাঁকা আছে, তেল মশলার কমতি নেই, তবে বাঙালি খিচুড়ি হলে যেন সে ভাগ পায়। উত্তরে আমি হাসি, হাত তুলে বোঝাই, ঠিক আছে। তাকে ক্যামেরার কথাটা বলতে পারি না।

সময় কেটে যায় দ্রুত। এখন রাত ন'টা। খিচুড়িও তৈরি। থালা চামচ নিয়ে খাওয়া শুরুর তাড়া দিচ্ছে সুকদেব। কারণ, এবার পর পর ট্রেন ঢুকবে। ক্যান্টিনে ভিড় বাড়বে। অগত্যা বসতেই হয়। শম্ভুদা'র থালায় খিচুড়ি, পাঁপড়, আচার, ওমলেট। দারুণ ব্যাপার। বাবু'র ভাষায় এটা আমাদের 'লাস্ট সাপার!' অতএব,

খাওয়া শুরু। ঠিক তখনই দারা সিং ঢুকল দলবল নিয়ে। দারা সিং নামটা আমার দেওয়া, ওর আসল নাম গুরদেব সিং। সুকদেব বলেছে। যাক, মনটা একটু শান্ত হয়। অন্তত ক্যামেরাটা ফেরত পাওয়া যাবে।

গুরদেব ইয়ারের মতো বসে পড়ে পাশে। 'সরি দাদা, ক্যামেরা-কা দাম আট'শ সে যাদা নেহি মিলেগা। কিঁউ কি ইয়ে মডেল বহোত পুরানা হ্যায় না। আরে স্যার, কেয়া বড়িয়া পাকায়া আপলোগ। খিচড়ি? হামে ভি খিলাইয়ে না' – সব কথা সে-ই বলে যায়। শুকদেব ওদের জন্য থালা নিয়ে আসে। খিচুড়ির জন্য চিন্তা নেই, যত চিন্তা শুধু ওই টিকিটের জন্য।

খাওয়া শেষ করে সে আমার হাত ধরে একধারে নিয়ে যায়, বলে, 'শুনুন, কোনও প্রবলেম নেই। আমার বাবা কথা বলেছে, উনি রেলের কন্ট্রাকটর। আপনাদের ফেরার ব্যবস্থা করে ফেলেছি।' আমার বাকরুদ্ধ দশা। আরও শুনলাম, 'আপনাদের ব্রেক জার্নি দেখানো হচ্ছে কানপুর থেকে। আর চণ্ডীগড় থেকে কানপুর পর্যন্তও একটা কিছু হয়ে যাবে।' কী বলে ওকে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাই না। তার সুযোগও পাই না। গুরদেব কাঁধের ব্যাগ থেকে ক্যামেরাটা বের সামনে ধরে। 'এমন সখের জিনিস হাতছাড়া করতে আছে?' – বলে সে ওটাকে আমার ব্যাগে ঢুকিয়ে দেয়। ওদিকে দলের সবাই হাঁ করে দেখছে আমাদের দিকে।

এরপর সে নিয়ে যায় স্টেশন সুপারের কাছে। উনি এখন দরাজ মেজাজে। বললেন, 'TTE, Guard সবাইকে জানান থাকবে। দিল্লিতে লোক বদল হলেও চিন্তা নেই। ব্রেক জার্নির কাগজ নিয়ে গুরদেবের এক বন্ধু কানপুরে ওয়েট করবে। সব বন্দোবস্ত ওরা করে ফেলেছে। ট্রেন পৌঁছলে স্ট্যাম্প সই-সহ টিকিট দিয়ে যাবে।' ইতিমধ্যে C C Super এসে গেছেন। শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বললেন, 'কলকাতায় গিয়ে বলবেন, পাঞ্জাবে শুধু গোলাগুলি চলে না। এখনকার লোকদের দিল আছে।'

দশটার পরে মালপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছি। শুনেছি একটা জেনারেল কোচ আলাদা করে লাগছে কালকা থেকে, আমাদের জন্য। গুরদেব রয়েছে আমাদের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের বাড়ি কলকাতার কোথায়?' আমি বললাম, 'সোনারপুর, ঠিক কলকাতা নয়, কলকাতার কাছে।' বলে ওকে বোঝাতে চাইলাম কীভাবে যেতে হয় সোনারপুর। সে আমাকে থামায়, আবার জিজ্ঞেস করে, 'মনোহরপুকুর জানো? প্রিয়া সিনেমা? ওখান থেকে কাছে হবে?' অবাক লাগে আমার।

- 'তুমি ছিলে ওখানে?'

- 'আমার বেস্ট ফ্রেন্ড অমিত থাকে। ও এখানে MD করছে। ওর সঙ্গে গেছি কলকাতায়। এবার গেলে তোমাদের ওখানেও যাব।'

ডাউন কাল্‌কা মেল ঢুকেছে ঠিক সময়ে। আরও চমক ছিল। রেল পুলিশের তদারকিতে আমাদের মালপত্র ঢুকল স্পেশাল জেনারেল কোচে। আমরা বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম, কিছুই করতে হ'ল না। ব্যাপার দেখে সবাই ভিআইপি নজরে দেখছে আমাদের। কী আর করি, উঠে বসলাম। হুইসেল শুনে আবার দরজার কাছে আসি। গুরদেব আমার হাতে একটা খাম তুলে দেয়। 'রেখে দাও, রাস্তায় কাজে লাগবে' – বলে হাতটা চেপে ধরে। ওর বন্ধুরা কয়েকটা প্যাকেট এগিয়ে দেয়, হুকুম দেয়, 'রাস্তায় খেয়ে নিও।'

ট্রেন ছেড়েছে। ওরা হাত নাড়ছে আর দূরে সরে যাচ্ছে।

গুরদেবের 'রাস্তায় কাজে লাগার' খামটা খুলে দেখলাম। ভিতরে দশটা এক'শ টাকার নোট! আমার চোখের কোণে জল।